# মানব-মুকুট

মোঃ এয়াকুব আলী চৌধুরী



বাঙ্লা একাডেমী, ঢাকা

# মানব-মুকুট

✤ ✤ ✤

মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী

✤ ✤ ✤

মূল্য ।০ চারি আনা।

# মানব-মুকুট

মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী



 মূল্য চারি আনা।

প্রকাশক

মোহাম্মদ আওলাদ আলী চৌধুরী,
ওরিয়েন্ট্যাল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড্।
৪০ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কার্ত্তিক—১৩২৯।

প্রিণ্টার—শ্রীশশীভূষণ পাল
মেট্‌কাফ প্রেস
৭৯ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

# প্রস্তাবনা
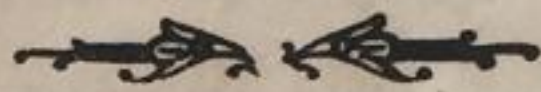
যে সমস্ত মহাপুরুষের আবির্ভাবে এই পাপ-পঙ্কিল পৃথিবী ধন্য হইয়াছে, যাঁহাদিগের প্রেমের অমৃত-সেচনে দুঃখ-তপ্ত মানব-চিত্ত স্নিগ্ধ হইয়াছে, যাঁহারা মানব-সমাজের যুগ-যুগান্তরের কুক্ষিগত কালিমারাশির মধ্য হইতে প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় উত্থিত হইয়া পাপের কুহক ভাঙ্গিয়াছেন, ধর্ম্মের নবীন কিরণ জ্বালিয়াছেন ও পতিত মানবকে সত্য ও প্রেমে সঞ্জীবিত করিয়া নবীন জীবন পথে টানিয়া লইয়া গিয়াছেন, ইসলাম ধর্ম্মের প্রচারক হজরত মোহাম্মদ তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার লোকোত্তর চরিত্রে জ্ঞান, কর্ম্ম ও প্রেমের যে অদ্ভুত সম্মিলন ঘটিয়াছিল, তাহা চিন্তা করিলে মানবাত্মার ঐশ্বর্য্য দর্শনে হৃদয় বিস্ময় ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; বিশ্বমানবের চিত্ত তাহার মহিমা এখনও সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় নাই।

ত্যাগ প্রেম ও কল্যাণের কথায় জগতে খৃষ্ট, বুদ্ধ ও চৈতন্যের নাম সসম্ভ্রমে উচ্চারিত হইয়া থাকে, কিন্তু মরুভূমির মহাপুরুষ হজরত মোহম্মদের নামে মনীষি-মণ্ডলীর মন যেন তেমন করিয়া ভক্তিতে উদ্বেলিত হয় না।

যীশুখৃষ্ট মানুষের জন্য ক্রুশকাষ্ঠে প্রাণদান করিয়াছিলেন, ইহা চিন্তা করিলে হিন্দুর মন ভক্তিতে স্তব্ধ হইয়া আসে; রাজনন্দন বুদ্ধ মানুষের জন্য রাজসিংহাসন তুচ্ছ করিয়া তরুচ্ছায়াতলে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা স্মরণ করিলে খৃষ্টানের চক্ষু হইতে দর দর ধারে প্রেমাশ্রু ঝরিয়া পড়ে; কিন্তু হজরত মোহাম্মদের নামে তাঁহাদের কানে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা বাজিয়া উঠে, চোখের উপরে নর-শোণিতের লোহিত রেখা স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়, মনের মধ্যে সন্দেহ ও বিভীষিকার ছায়া নিবিড় করিয়া ঘনাইয়া আসে। কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ের অধীশ্বর বলিয়া তিনি সম্মান প্রাপ্ত হন, কিন্তু সাধারণ বিশ্ববাসী বিশ্বপ্রেমিক মহাপুরুষের প্রেম-মণিময় রাজমুকুট তাঁহার শিরে অর্পণ করিতে সঙ্কুচিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

মানুষ যেন এখনও মানবের উদ্ধারকামী মহা-পুরুষের ভোগলেশশূন্য চিরপরিচিত সন্ন্যাসী মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে পত্নী-পরিবৃত গৃহি-মূর্ত্তি দর্শনে সংশয় জিজ্ঞাসায় তাকাইয়া আছে, তাহার মন অনাবিল ভক্তিধারায় কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে নাই।

তথাপি ইহা বলিতে হইবে যে মানুষ হজরত মোহাম্মদকে প্রাণের সিংহাসনে নিঃশেষে অভিষেক করিয়া না লওয়ায় তাহার চিন্তাশক্তির লঘুতা ও সঙ্কীর্ণতাই প্রকাশ পাইয়াছে। এই মানবতার যুগে সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া মানুষরূপে বিশ্বমানবের নিকটে ইহা অসঙ্কোচে বলিবার সময় আসিয়াছে যে হজরত মোহাম্মদ মানবতার যে মহিমা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা শুধু অসামান্য নহে অতুলনীয়; মুহুর্ত্তের মৃত্যু দ্বারা নহে, পরন্তু বহুবর্ষব্যাপী জীবন দ্বারা মানুষের জন্য আত্মত্যাগের যে আদর্শ তিনি দেখাইয়াছেন তাহার নিকটে বুদ্ধের সুখ ত্যাগ ও খৃষ্টের প্রাণত্যাগ নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে।

মানুষ পাপের ঘোরে মরিতে মরিতে যাঁহাদের শক্তি ও প্রেমের অমৃতরস পান করিয়া বাঁচিয়া উঠিয়াছে, তাঁহারা সকলেই অরণ্যচারী সন্ন্যাসী ছিলেন না ; পশ্চিম এশিয়ায় যে সমস্ত পয়গম্বরের আবির্ভাব হইয়াছিল, একমাত্র যীশুখৃষ্ট ব্যতীত তাঁহাদের কাহারও জীবনের সঙ্গে গৃহধর্ম্মের বিরোধ ছিল না ; ভারতের বুদ্ধ, শঙ্কর ও চৈতন্য গৃহহীন সন্ন্যাসী ছিলেন বটে, কিন্তু যে কৃষ্ণ হিন্দুর মস্তক-মণি, তাঁহাকে ইউরোপীয়গণ রাজনৈতিক চক্রী পুরুষ বলিতে কুণ্ঠিত নহেন।

ফলতঃ মানব-হিতৈষী আত্মত্যাগী মহাপুরুষকে কেবলমাত্র সন্ন্যাসী বেশে সাজাইতে গিয়া মানুষ আত্মশক্তির প্রতি নিতান্ত উপেক্ষার পরিচয় প্রদান করিয়াছে সন্দেহ নাই।

গৃহহীন সন্ন্যাসীর ত্যাগ যতই মোহনীয় হউক না কেন কখনই বরনীয় নহে ; তাহা মানুষের নিকটে ত্যাগ সাধনার চরম আদর্শরূপে কিছুতেই গৃহীত হইতে পারে না। গৃহহীন খৃষ্ট বুদ্ধের প্রেম ও ত্যাগ আমাদিগের মনকে এতকাল মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিবার সময়

আসিয়াছে যে, কে সেই মহাপুরুষ যিনি মানবের চিরকালের আবাস ভূমি গৃহাঙ্গনকে তুচ্ছ না করিয়া পবিত্র ও মধুর করিয়াছেন; মানুষের বিচিত্র সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষাময় মর-জীবনকে জীবন দ্বারা সার্থক ও সুন্দর করিয়া অনন্ত জীবনের সন্ধান দিয়াছেন; মানব সমাজকে পরিত্যাগ করিয়া নহে, পরন্তু মানুষের মধ্যে বাস করিয়া, মানুষের সঙ্গে বিচরণ করিয়া, বিশ্বমানবের জীবনধারার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগ রাখিয়া কে মানুষকে ভাল বাসিয়াছেন, রক্ষা করিয়াছেন, ত্যাগের দুর্জ্জয় সাধনা করিয়াছেন; তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। তিনিই মানুষের অতি আপন প্রাণের ধন পরমাত্মীয়; মহাপুরুষের গৌরব-মুকুট তাঁহারই প্রাপ্য।

---
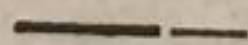
# মহাপুরুষের মানবতা

হজরত মোহাম্মদ মানবতার সুমহান গৌরব; তিনি ঈশ্বরের পুত্র বা অবতার নহেন, তিনি মানুষ, —ইহাতেই তাঁহার সার্থকতা ও ইহাতেই তাঁহার অহঙ্কার। তিনি মানুষের মহিমা ও গৌঃবের যে ডঙ্কা বাজাইয়াছেন, মানুষের পক্ষে তাহা অতি বড় গৌরবের বিষয়।

মানুষ যেমন একদিকে মহান ও অসীম আল্লাকে বিস্মৃত হইয়াছিল, পক্ষান্তরে তেমনি স্বীয় বিরাট ও মহতী সত্বাও হারাইয়া ফেলিয়া, মানুষের প্রাপ্যকে দেবতার স্কন্ধে চাপাইয়া আপনাকে ছোট করিয়া ফেলিয়াছিল। ঝড় যেমন অন্ধকারের নিবিড় ছায়াপাতকারী ঘোর কৃষ্ণ মেঘমালাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া আকাশ ও পৃথিবী উভয়কেই আলোকে উজ্জ্বল করিয়া তুলে, তিনিও তেমনই মানবমনের বহুযুগ-সঞ্চিত ভ্রমান্ধকার দূরীভূত করিয়া আল্লা ও মানুষ উভয়ের সত্তাকেই ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি

যেমন বলিয়াছেন, একমাত্র আল্লা ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই, পতিত মানুষের নিকটে তেমনি উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন, হে মানব, আমি আল্লার দূত ও দাস, আমি দেবতা নই, অবতার নাই,—"আনা বশরোম মেস্লোকোম" আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ।

হজরত মোহাম্মদের এই বাণী মনুষ্যত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জয় ঘোষণা, মানুষের কাছে মহাপুরুষের চরম ও মহত্তম দান। ইহা মানুষের চিন্তারাজ্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে ও মানবতার ইতিহাসে এক অভিনব অধ্যায় উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বে মানুষ আপনাকে হীন করিয়া দেখিয়াছে, আত্মশক্তি সম্বন্ধে সে কেবলই নিদারুণ অজ্ঞতার পরিচয় দিয়া আসিয়াছে। মানুষ এতকাল যাঁহারই মধ্যে শক্তির সন্ধান পাইয়াছে, যিনিই তাহাকে ক্ষমতায় স্তব্ধ, মহত্বে মুগ্ধ বা সান্নিধ্যে স্নিগ্ধ করিয়াছেন, মানুষ তাঁহাকেই দেবতা বানাইয়া ঈশ্বরের পুত্র বা অবতার ভাবিয়া একেবারে পর করিয়া দিয়াছে। সে কিছুতেই মহাপুরুষকে মানুষ বলিয়া ভাবিতে, আপন

বলিয়া দাবী করিতে পারে নাই; মহাপুরুষের মধ্যে মানুষেরই উন্নতি দর্শনে উদ্বুদ্ধ হইবার সুযোগ ও সাহস পায় নাই।

হজরত মোহাম্মদ মানুষের এই নিদারুণ ভ্রম একেবারে বিদূরিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি আপনাকে আল্লার দাস ও মানুষরূপে ঘোষণা করিয়া, মানুষের সমগ্র জীবন ব্যাপারে আপনাকে মিশ্রিত করিয়া মানুষের মনের মধ্যে এই মহা সত্য দৃঢ়রূপে আঁকিয়া দিয়াছেন যে, মানবত্রাতা মহাপুরুষ মানুষ হইতে উচ্চ নহেন, মানব-সত্বার সীমার বাহিরে নহেন, তিনিও মানুষ—মানুষেরই তিনি মহত্তম পরিণাম।

শত শত মানুষ যাঁহার বানীর বেদনায় অধীর হইয়া ধর্ম্মকে বরণ করিয়াছে, শত শত আর্ত্ত যাঁহার সেবায় স্নিগ্ধ হইয়াছে, যিনি মানুষের দুঃখে দুঃখিত হইয়া মণি কাঞ্চনের মধ্যে থাকিয়াও অল্লাহারে ও অনাহারে জীবন যাপন করিয়াছেন, অথচ যাঁহার অঙ্গুলিহেলনে রাজমুকুট ধুলায় লুটাইয়াছে, যাঁহার স্বর্গীয় তেজে উদ্দীপ্ত হইয়া মরুভূমির অসুর দেখিতে দেখিতে মানুষ হইয়া

মহত্ত্বের মহিমা লইয়া দিগ্‌দিগন্তে ছুটিয়া চলিয়াছে, সেই মহাপুরুষকে নিঃশেষে ঘরের মধ্যে লাভ করিয়া, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, তাঁহার মুখে "আমি মানুষ" শুনিয়া মানুষের মন উন্নত হইয়াছে; মানুষের সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হইয়াছে। মানুষ বহুদিন পরে আপনাকে চিনিতে পারিয়া উজ্জ্বল রাগে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

খৃষ্ট বুদ্ধ ও চৈতন্য অহিংসা ও প্রেমের মন্ত্র প্রচার করিয়া মানুষকে উৎকৃষ্ট নীতি শিক্ষা দিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা মানুষের উপাস্য সম্বন্ধে নীরব থাকিয়া, মহাপুরুষকে ঈশ্বরের আসনে বসাইতে দিয়া মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনকে শোচনীয়রূপে পঙ্গু করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। হজরত মোহাম্মদও মানুষকে প্রেম ও ক্ষমার উপদেশ দিয়াছেন, আত্মজীবনে তাহার জ্বলন্ত আদর্শ দেখাইয়াছেন; কিন্তু তিনি আরও করিয়াছেন; তিনি মহাপুরুষের কল্পিত দেব-সিংহাসনে সবলে পদাঘাত করিয়া মানবতার উদার সমতলে দাঁড়াইয়া উর্দ্ধে অঙ্গুলি তুলিয়া বলিয়াছেন, ঐ একমাত্র মহান আল্লা ছাড়া হে

মানুষ! তোমার আর কোন উপাস্য নাই; ঐ আল্লা ছাড়া তোমার চেয়ে আর কেহ বড় নহে। এই মহাবানী মানুষের মর্ম্মে মর্ম্মে সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে এমন করিয়া উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, তাহার আত্মার আগুন এমন করিয়া জ্বালাইয়া দিয়াছে, তাহার আধ্যাত্মিক জীবনকে এমন উর্দ্ধগতি প্রদান করিয়াছে যে তাহার সঙ্গে আর কিছুরই তুলনা হইতে পারে না।

বৈদান্তিক শঙ্করাচার্য্য মানুষকে ঈশ্বর বলিয়াছেন। তাঁহার এই মতের যৌক্তিকতা আলোচনা না করিয়াও বলা যাইতে পারে, তিনি প্রকৃতপক্ষে ইহাদ্বারা মানুষের জয় ঘোষণা করেন নাই, সমস্তই যে এক অখণ্ড জগদাত্মার বহির্বিকাশ মাত্র তাহাই বুঝাইয়া-ছেন। তিনি মানুষের স্বতন্ত্র সত্বাকে একেবারে ডুবাইয়া দিয়াছেন। তিনি জীবময় নিরীশ্বর বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিতে গিয়া একেবারে চরমান্তরে পৌঁছিয়াছেন; ঈশ্বরের সর্ব্বময়ত্ব এমন করিয়াই ঘোষণা করিয়াছেন যে জীবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব একবারে মুছিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার 'সোহম'

'একমেবা দ্বিতীয়ম' মনুষ্যত্বের জয় ঘোষণা নহে। তিনি মানুষকে ঈশ্বরের সহিত অবিচ্ছেদে যুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিয়া প্রকৃতপক্ষে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি-চেষ্টাকে হত্যা করিয়াছেন। কারণ যে নিজেই পরম ও চরম—যাহার উপরে আর কেহ নাই, তাহার আবার উন্নতির সার্থকতা কোথায় ? তাহার ঊর্দ্ধগতির অর্থ কি ? তাহার চেষ্টার অবসর নাই, সাধনার আনন্দ নাই, বিকাশের উল্লাস নাই। তাহাকে অনন্তের আত্মীয় করিয়া নিতান্তই সান্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

না—মানুষের মন ইহা মানিয়া লইতে সম্মত হইতে পারে না। সীমাহীন ঊর্দ্ধগতির যে আনন্দ, মানুষ কিছুতেই তাহা ত্যাগ করিতে পারে না। মাথার উপরে তাহার অতুলনীয় অতি বড় মহান একজনকে চাইই চাই। সেই উচ্চতম মহানকে লাভ করিবার যে অন্তহীন সাধনা তাহাতেই মনুষ্যত্বের মহত্তম বিকাশ। সেই যে মহতোমহীয়ান চিরদিন মানুষের মনকে আকর্ষণ করিতেছে, সাধনার পর সাধনাকে বিফল করিয়া ক্রমাগত ডাকিয়া চলিয়াছে, ধরি ধরি

করিয়া যাহাকে ধরা যাইতেছে না, অথচ যাহাকে ধরিতেই হইবে, নহিলে কিছুতেই প্রাণের তৃষ্ণা মিটিবে না, সেই সত্য ও সুন্দরকে লাভ করিবার যে অবিরাম আয়োজন ও অশ্রান্ত পদক্ষেপ চিত্ত-কমল তাহাতেই নিত্য নব দলে বিকশিত হয়, আত্মা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বল রাগে হাসিয়া উঠে।

এই দার্শনিকতার জটিল জাল ত্যাগ করিয়াও বলা যাইতে পারে সেই "সোহম্"-বাদী জ্ঞান যোগী সন্ন্যাসীকে মানুষ দূর হইতে নমস্কার করিতে পারে, আপন বলিয়া আলিঙ্গন করিতে পারে না। বিশ্ব মানবের নিখিল জীবন ধারার সঙ্গে তাঁহার জীবনের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। তিনি সংসার-ত্যাগী গুহাবাসী সন্ন্যাসীর আদর্শ হইতে পারেন ; কিন্তু তাঁহার মত ও জীবন গৃহবাসী সুবিপুল মানব-সমাজের জীবন-মূলে রস সঞ্চার করিতে সমর্থ নহে। তিনি মানব-সাধারণের উদ্ধার কর্ত্তা নহেন। তাঁহার প্রদত্ত রাজগিরি লইয়া মানুষের জীবন চলিতে পারে না।

কিন্তু হজরত মোহাম্মদ মানব জীবনের কেবল মহিমা ছিলেন না। তিনি মানুষের নিত্য ও

স্বাভাবিক জীবনের সুগভীর অভিব্যক্তি "A fiery mass of life cast up from the bosom of nature herself"

একদিকে যিনি ভূলোক দ্যুলোক অতিক্রম করিয়া স্রষ্টার সন্নিহিত হইয়াছেন, যিনি অধ্যাত্মের অমৃত-উৎস উৎসারিত করিয়া মানুষকে মরজীবনে অমরত্ব লাভের সহায়তা করিয়াছেন, যিনি বলিয়াছেন, "আমার বাণীই ধর্ম্ম-বিধি, আমার কার্য্যই ধর্ম্মমত ও আমার অবস্থাই সত্য", তিনিই পক্ষান্তরে সাতদিন অনাহারে থাকিয়া জীবিকার্জ্জনের জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন, লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, শত্রুর অসিতলে মস্তক রাখিয়া আল্লার নাম বলিয়াছেন, পুত্রের মৃত্যু-শোক হৃদয়ে ধরিয়াছেন, বৃদ্ধার বোঝা বহিয়াছেন ও ভৃত্যের সেবা করিয়াছেন, বন্ধুর বিবাহোৎসবে আনন্দ করিয়াছেন ও শোকে সান্ত্বনা দিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় কে আর মানুষের শক্তি দেখাইয়াছে? মানুষকে উন্নতির প্রেরণা দিয়াছে? তাঁহার কার্য্যে মানুষের বুকে ভরসা আসিয়াছে, উন্নতির আবেগে মানবচিত্ত দুর্নিবার বেগে কম্পিত হইয়াছে। যুগ যুগের

তুচ্ছ ও উপেক্ষিত মানুষ আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ হইয়া মহত্ত্ব ও মহিমার সিংহাসনের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবার অবসর পাইয়াছে। যিনি মরণকে রহস্য বলিয়াছেন, তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন, জীবনের রহস্য এত গভীর, জটিল ও বিপজ্জনক যে মৃত্যু-রহস্য তাহার তুলনায় কিছুই নহে। এই জীবন সমস্যার মীমাংসা করিতে না পারিলে মানুষের নিস্তার নাই। এই শত দুঃখ-দৈন্য, রোগ-শোক, এই অনন্ত পাপ-প্রলোভন, স্বার্থ-তাড়না, মায়া-মোহ, ইহার মধ্যে থাকিয়া কি উপায়ে ধর্ম্মের সহিত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে, মাতা পিতা পুত্র পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিয়া বৃহৎ ও বৃহত্তর সমাজ ও রাষ্ট্র জীবন অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কি উপায়ে সত্য সুন্দর ও মঙ্গলের সহিত জীবনের নিগূঢ় সম্মিলন স্থাপন করা যায়, ইহাই মানুষের সর্ব্বপ্রধান সমস্যার বিষয়। মানুষকে এই সমস্যার মীমাংসা করিতেই হইবে। এই সমস্যার দুরূহতা চিন্তা করিয়া ভারতের অন্যতম মহাপুরুষ বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, ক্ষুধার্ত্ত লোকের নিকটে ধর্ম্মের কথা বলিয়া লাভ নাই, অগ্রে তাহার

পেটের জ্বালা শান্ত কর, তারপর ধর্ম্মের কথা বলিও।

বস্তুতঃ জীবন ভার বহন করিতে অসমর্থ হইয়া, জীবন-যুদ্ধে পরাজিত ও মথিত হইয়া মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করা অসম্ভব নহে। পাপের রুদ্রলীলাময় সংসারে পাপের স্পর্শ পরিহার করিতে অক্ষম হইয়া লোকালয় হইতে বহুদূরে বা মানবসমাজের সীমান্তরালে সন্ন্যাসের আশ্রয় লওয়া সুকঠিন নহে। কিন্তু তাহা বিশ্ব-মানবের পক্ষে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ব্যাপার। মানুষকে ঘর সংসার বাঁধিয়া বস-বাস করিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। ইহাই তাহার নিয়তি ও ইহাতেই তাহার পৌরুষ। মরিয়া যাওয়া অপেক্ষা বাঁচিয়া থাকা কঠিন। সাংসারিক জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত দুঃখ ও পাপের সহিত দুর্নিবার সংগ্রামে রক্তরঞ্জিত। সংগ্রাম পরিহার করা অপেক্ষা সংগ্রাম জয় করাই মহত্তর শক্তির পরিচায়ক। তাহা যতই কঠিন হউক না কেন, তাহাই স্বাভাবিক ও সুমহান্।

সুতরাং জীবন সমস্যার সমাধান করিয়া ধর্ম্মের

আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠাই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ও সুমহান্ লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সাধনে যিনি মানুষকে সহায়তা করিয়াছেন, আত্ম জীবনে জীবন-সমস্যার সমাধান করিয়া ধর্ম্মের মহিমা দেখাইয়াছেন, তিনিই মানুষের প্রকৃত উদ্ধার কর্ত্তা। খৃষ্ট, বুদ্ধ, শঙ্করও চৈতন্যের জীবন জ্ঞান-প্রেমে যতই উজ্জ্বল হউক না কেন, এ সম্বন্ধে একেবারে অন্ধকার। তাঁহারা এ সম্বন্ধে আমাদিগকে যথেষ্ট মূল্যবান উপদেশ দিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের জীবনের শিক্ষা এ বিষয়ে একেবারে নির্ব্বাক। মানুষ তাঁহাদ্দিগকে ভক্তি করিতে পারে, ভালবাসিতে পারে, তাঁহাদের প্রেমের বচন পদ্মরাগ মণির ন্যায় মস্তকে ধারণ করিতে পারে, কিন্তু তাঁহাদিগকে আদর্শরূপে গ্রহণ ও অনুসরণ করিতে পারে না। তাঁহারা পথের ধারে গলিত কুষ্ঠ রোগী পড়িয়া থাকিলে কি করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে আমাদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন। কিন্তু কি করিয়া সদুপায়ে ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করা যায়, পত্নীর প্রেমার্ত্ত চিত্ত স্নিগ্ধ করিয়া পাতার প্রীতিলাভ করা যায় তৎসম্বন্ধে

কিছুই শিক্ষা দিতে পারেন না। অন্যায় হইলেও সহজ উপায়ে বিপুল বিত্ত হস্তগত হইবার সম্ভাবনা ঘটিলে কেমন করিয়া লোভ দমন করা যায়, চির বৈরীকে পদতলে প্রাপ্ত হইয়াও কিরূপে প্রতিহিংসার পৈশাচিক অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া প্রেমের অমৃত ঢালা যায়, সুরসুন্দরিগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া মঙ্গলময়ের ধ্যান করা যায়, একমাত্র পুত্রের বিয়োগে পত্নীর দুর্নিবার শোকোচ্ছ্বাসের সম্মুখে প্রসন্নচিত্তে অবস্থান করা যায়, ছিন্নবাস-পরিহিত পত্নী-কন্যার ক্ষুধা-কাতর মলিন মুখের দিকে তাকাইয়া দুঃসহ রোগ যন্ত্রণার মধ্যে বিধির ইচ্ছা স্মরণ করিয়া পুলকিত হওয়া যায়, মানব জীবনের এই সমস্ত স্বাভাবিক ও নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যাপারে তাঁহারা কিছুই শিক্ষা দিতে পারেন না। জীবনের পদে পদে দুঃখ ও পাপ জয় করিয়া সুখ ও সোহাগের মোহ কাটাইয়া কিরূপে চিত্তকে শুদ্ধ ও প্রবুদ্ধ করিয়া ভূমানন্দে নিমজ্জিত হওয়া যায়, মহাপুরুষের জীবনে তাহার সংগ্রাম ও সিদ্ধি চিহ্ন দেখিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য, শক্তি ও সাহস সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত সাংসারিক পাপ

তাপের মধ্যে মানুষের মন স্বতঃই লালায়িত হইয়া থাকে; কিন্তু তাঁহাদের জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মানুষ ইহার কোন উত্তর প্রাপ্ত হয় না।

মানুষের নিকটে স্বাভাবিক ধর্ম্মজীবনের আদর্শ-স্থাপনকারী রূপে সকলের উপরে দুই জন মহাপুরুষের কথাই মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। একজন শ্রীকৃষ্ণ, অপর হজরত মোহাম্মদ। ইঁহারা উভয়েই গৃহী ছিলেন, সমাজে বাস করিয়াছেন, জাতীয় জীবনে ক্রিয়া করিয়াছেন ও তদবস্থায় মানুষকে স্বাভাবিক উপায়ে ধর্ম্ম সাধনের উপদেশ দিয়াছেন; বিশ্লেষণ করিলে উভয়ের কথাই এক হইয়া দাঁড়ায়,—ভোগের মধ্যে থাকিয়া ত্যাগের সাধনা কর, সংসারে থাকিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন কর। কিন্তু উভয়ের শিক্ষা এক হইলেও উভয়ের জীবনের প্রেরণার মধ্যে বিষম বৈষম্য বিদ্যমান।

শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক পুরুষ। তাঁহার জীবন-কাহিনী ও চরিত্র-কথা রূপক ও কিম্বদন্তীতে এরূপ সমাচ্ছন্ন যে তাহার কুহেলিকা ভেদ করিয়া প্রকৃত মানুষের পরিচয় পাওয়া ও তাহার সহিত

জীবনের সম্বন্ধ স্থাপন করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তাঁহার রাসলীলার অধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অনেকে তাঁহার মানবীয় অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়াছেন; বিশ্বের প্রাণভূত যে পরমাত্মা বা পরম পুরুষ সমুদয় জীবাত্মাকে আকর্ষণ করিতেছে, যিনি সমুদয় জীবের হৃদয়ানন্দ পরম ধন, শ্রীকৃষ্ণ তাহারই রূপক মূর্ত্তি। কৃষ্ণ নামে শরীরবিশিষ্ট আদৌ যে কোন মানুষ বিদ্যমান ছিলেন, ইহাই সংশয় ও জিজ্ঞাসার বিষয়; সুতরাং এরূপ জীবনের প্রেরণা সাধারণ মানব-জীবনের উপরে কার্য্য করিতে পারে না।

• তথাপি যদি গীতার কৃষ্ণকে সত্য ও জীবন্ত মানুষ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলেও তিনি মানুষের আদর্শ বা উদ্ধারকর্ত্তা নহেন। সত্য হইলে তিনি বিস্ময় ও নৈরাশ্যের পাত্র মাত্র, অনুসরণের বস্তু নহেন; মানুষের সহায় ও বান্ধব নহেন। কারণ তিনি আপনাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; মানুষও তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার জ্ঞানে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে। তিনি মানুষ নহেন, ঈশ্বরের অবতার; তাঁহার কার্য্য-

সমূহ দেবতার লীলামাত্র, মানুষের মহত্ত্ব-মহিমা ও গৌরব-গরিমা নহে।

পক্ষান্তরে হজরত মোহাম্মদের জীবন ও চরিত্র কল্পনা-কুহেলিকায় অন্ধকার নহে; তাহা ঐতিহাসিক সত্যের রুদ্রালোকে স্পষ্ট স্বচ্ছ ও সমুজ্জ্বল। তিনি হাড়ে হাড়ে মানুষ। তাঁহার জীবনের প্রত্যেক দিনের ঘটনাবলী বর্ণনা করা যাইতে পারে। তিনি প্রত্যেক দিন কি পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিতেন, কতক্ষণ বিশ্রাম করিতেন, কোন দিন কাহার সহিত কি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বৈদেশিক রাজার নিকট তাঁহার প্রেরিত পত্র ও পরিচ্ছদের নিদর্শন এখনও মুসলমানদিগের গৃহে রক্ষিত হইতেছে। তাহার কোনটিই ভক্তের কল্পনা নহে, ঐতিহাসিক গবেষণার রুদ্রালোকে পরিচিত সত্য। শত শত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে এখনও মুসলমানের ধমনীতে ধমনীতে তাঁহার শোণিত-প্রবাহ সঞ্চালিত হইতেছে। শত শত মুসলমানের জীবনে তাঁহার আহার বিহার পোষাক পরিচ্ছদ ও রীতি-

নীতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। দুর্জ্জয় দুর্ব্বিপাকে এখনও তাঁহার স্নিগ্ধ মধুর গম্ভীর বাণী মুসলমানদিগের প্রাণের মধ্যে গভীরভাবে বাজিয়া উঠে; দুঃখ-দৈন্যে মুহ্যমান গৃহী এখনও সেই গৃহবাসী চিরদরিদ্র মহাপুরুষের দারিদ্র্য-দর্প স্মরণ করিয়া সহিষ্ণুতায় বলীয়ান হয়। রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে পরিবারবদ্ধ হইয়া বাস করতঃ কিরূপে স্বাভাবিক ভাবে ধর্ম্ম সাধন করিতে হয়, সন্তোষের সহিত জীবন ভার বহন করিয়া পরের মঙ্গল সাধন করা যায়, প্রভুর সহিত জীবনের যোগ স্থাপন করা যায়, তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত তিনি মানুষকে প্রদর্শন করিয়াছেন।

---
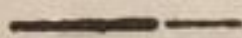
# মানুষের অধিকার

হজরত মোহাম্মদের জীবন ও শক্তির স্বাভাবিকতা তাঁহাকে মানবসাধারণের পরম আত্মীয় ও পরম আদর্শ করিয়া রাখিয়াছে। এই সুখদুঃখময় সংসারে সাধারণ মানুষ ধর্ম্মজীবনের কি মহাগ্রামে উঠিতে পারে, অকস্মাৎ প্রত্যাদেশ পাইয়া নহে, অসাধ্য কৃচ্ছ্র সাধনা করিয়া নহে, পরন্তু মানব জীবনের সাধারণ গতির সহিত সমন্বয় রাখিয়া কিরূপে ভিতরে বিকাশ লাভ করতঃ স্তরে স্তরে পদক্ষেপ করিয়া উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে পারে, হজরত মোহাম্মদের শক্তি-সাধনা তাহার চমৎকার উদাহরণ। তুমি আমি সাধারণ মানুষ যে বড় হইতে পারি, অধ্যাত্মের জ্ঞানপুণ্যময় উজ্জ্বল আলোকমণ্ডলে উঠিয়া দেবত্বের সুধা পান করিতে পারি, ইহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব?—কি দেখিয়া বিশ্বাস করিব? ধর্ম্মজীবনের অধিকার-লাভ কি আমারই

সাধ্যায়ত্ত? উর্দ্ধ জীবনের অন্তঃহীন গতি, তাহাতে কি আমারই অধিকার?

বুদ্ধ, খৃষ্ট, কৃষ্ণ, শঙ্কর ও চৈতন্যের শক্তিলাভের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা এ প্রশ্নের যে উত্তর প্রাপ্ত হই, তাহা নিরাশা ও অবসাদময়। যীশুখৃষ্ট ও শ্রীকৃষ্ণ আজন্ম মহাপুরুষ। শৈশবেই তাঁহাদের শক্তির লীলা-বিলাস। তাঁহাদের জীবন-সাধনার কোন ক্রম আমরা দেখিতে পাই না। তাঁহাদের শক্তি-সাধনার আরম্ভ কেমন করিয়া, তাহার কোন পরিচয়-চিহ্নই আমরা প্রাপ্ত হইনা। তাঁহাদের শক্তির যৌবন-জোয়ার আমাদিগকে প্রথমেই অভিভূত করিয়া ফেলে, আমরা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইবার অবসর পাই না।

শঙ্করাচার্য্য বালককালেই মহাপণ্ডিত ও ধর্ম্মবীর— একেবারেই মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের মত প্রখর কিরণ-জালে দেদীপ্যমান অসাধারণ শক্তির অবতার। সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক ভাবে সে শক্তির অধিকারী হইবার আশা করিতে পারে না।

চৈতন্যদেব যৌবন পর্য্যন্ত পাণ্ডিত্যের চর্চ্চা করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন, মাতা পত্নী পরিত্যাগ

করিয়া গৃহ ছাড়িলেন, পণ্ডিত্যের জয়-গৌরব দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রেমের পাগল হইলেন। কি সে মহামন্ত্র যাহা দিগ্বিজয়ী সুপণ্ডিত যুবককে যশ ও প্রতিষ্ঠার সিংহাসন হইতে নামাইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে মানুষের পায়ের তলে পথের ধুলায় লুণ্ঠিত করিল, তাহা মানুষের নিকটে রহস্য বিস্ময়ে সমাচ্ছন্ন।

বুদ্ধদেবের জীবনের প্রথম হইতেই মহত্ত্বের প্রেরণা চলিয়াছে,কিন্তু সে মহত্ত্বের পরিণতি দৃশ্যতঃ বিকাশের নিয়মে সাধিত নহে; জীবের দুঃখবার্ত্তা তাঁহার চিত্তে বাতাসের মত অদৃশ্য ভাবেই ভাসিয়া আসিয়াছে। সিদ্ধার্থ ও বুদ্ধের দেহের উপরে দুঃখের যতখানি দাবাগ্নি ঝলসিত হইয়াছে, শাক্যসিংহের তনুর উপরে সুখের ততখানি পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছে। শাক্যসিংহ রাজনন্দনের মতই সুখের সৌধে পালিত হইয়াছেন; রাজপুত্রের আচার ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছেন; রাজভবনের সোহাগ-বিলাস ইচ্ছায় না হইলেও সম্ভোগ করিয়াছেন। উত্তরকালে দুঃখ সাধনার যে হোম-শিখা তাঁহাকে দগ্ধ করিয়াছিল, তাঁহার জীবনের

সহিত প্রথমে তাহার পরিচয় ঘটে নাই। বুদ্ধের সংসার-ত্যাগ ও কৃচ্ছ সাধনা সাধারণ মানুষের নিকট বিভীষিকাময় অসাধারণ ব্যাপার, সাধারণ মানুষ তাহার অনুসরণ করিয়া বড় হইবার আশা করিতে পারে না।

সুতরাং মনুষ্যত্বের মহোচ্চ সোপানে—ভূমার পূর্ণানন্দময় আলোক-মণ্ডলে উঠিবার অধিকার আমাদের নাই। সেজন্য বিধির বিশেষ অনুগ্রহ চাই; তাহাতে তোমার আমার অধিকার নাই। কিন্তু হজরত মোহাম্মদের জীবন, শক্তির বিকাশ ও জীবনের সাধনা পরিষ্কাররূপে প্রকাশ করিতেছে যে, আছে—সে অধিকার মানুষের আছে; প্রত্যেক মানুষ বড় হইতে পারে, মহীয়ান হইতে পারে, অধ্যাত্মের মহিমালোকে গরীয়ান আসন লাভ করিতে পারে।

সত্যবটে ধর্ম্মস্থাপক মহাপুরুষ বিধাতার বিশেষ বাণী জগতে বহন করেন, তিনি প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত পয়গম্বর, ভগবানের নির্ব্বাচিত ব্যক্তিরূপে মানবোদ্ধারের জন্য জনসমাজে প্রেরিত হন; কিন্তু হজরত মোহাম্মদ কেবলমাত্র বিধিদত্ত বিশেষ শক্তির

অধিকারেই বার্ত্তাবাহক মহাপুরুষের সিংহাসন প্রাপ্ত হন নাই। তিনি আজন্মের সাধনায় ভার বহনের উপযুক্ত হইয়াই মানবোদ্ধারের মহাব্রত মস্তকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার শক্তিলাভের ইতিহাস ক্রমোন্নতির ইতিহাস ও স্বভাবের ব্যাপার। তিনি যে শক্তি-লাভ করিয়াছিলেন তাহা জন্মগত অধিকার নহে, উন্মাদিনী শক্তির আকস্মিক আবির্ভাবেরও পরিণাম নহে, তাহা স্বাভাবিক বিকাশ ও সাধনার ফল। পুষ্পকোরক রসে গন্ধে পূর্ণ হইয়া দলের পর দল মেলিয়া যেমন করিয়া ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠে, তাঁহার শক্তিও তেমনই ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়ে বিকাশলাভ করিয়াছিল।

শৈশব হইতে দুঃখানলে দগ্ধ হইয়া তাঁহার আত্মা দর্পণের মত উজ্জ্বল হইয়াছিল; জন্মের পূর্ব্বে পিতা হারাইয়া, জন্মের পরে মাতার বক্ষ-হারা হইয়া, আশ্রয় হইতে আশ্রয়ান্তরে গমন করিয়া তিনি নিজে যে দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন, তাহাতে মানুষের দুঃখে তাঁহার অন্তর সত্য সহানুভূতিতে পূর্ণ হইয়াছিল। দুঃখের মধ্যে থাকিয়াই তিনি

মানুষের দুঃখে সত্য করিয়া কাঁদিতে শিখিয়াছিলেন। কেবল মাত্র অনুভূতি-সূত্রেই তাঁহার মর্ম্ম-বীণায় বিশ্ববেদনার ঝঙ্কার উঠে নাই। সে ব্যথা সেই মাতাপিতৃহীন অনাথ বালককে জন্মাবধি শত দুঃখ-দৈন্য-শোক-সন্তাপরূপে সাক্ষাৎ-ভাবে নিপীড়ন করিয়া মানুষের ব্যথা তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে সঞ্চারিত করিয়াছিল। স্বীয় স্নেহ-বঞ্চিত দুঃখতপ্ত চিত্তের মধ্যে জগতের যত অনাথ মাতৃহীন শিশু,তাহাদের বেদনা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। উত্তরকালে যিনি বিপুল শক্তির অধীশ্বর হইয়াও জীবিকার্জ্জনের নিমিত্ত পরিশ্রম করিতে গিয়া ইহুদির হস্তে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন, ধন রত্নের মধ্যে অবস্থান করিয়াও যিনি সপ্তাহের অনশনে উদরে পাথর বাঁধিয়াছিলেন, তিনি শৈশব-কৈশোরে অনশনের কি ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। ধনীর সৌধমালার উপরে পদ স্থাপন করিয়াও চিরজীবন যিনি খর্জ্জুর পত্রের উপরে শয়ন করিয়াছিলেন তাঁহাকে প্রথমে কত রাত্রি ভূশয্যা আশ্রয় করিতে হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে

পারা যায়। কোরেশকুলের মধ্য-মণিকে জীবিকার্জ্জনের জন্য খোদেজা রাণীর দাসত্ব-পেটিকা ধারণ করিতে দেখিয়া তাঁহার পিতৃব্য আবুতালেবের চক্ষুতে যে অশ্রু-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার অন্তরালে দুঃখ-দৈন্যের রক্ত-লোহিত কি বেদনা সঞ্চিত ছিল, তাহা অনায়াসে অনুধাবন করা যাইতে পারে। ছাগচারক ও ব্যবসায়ীরূপে কঠিন পর্ব্বত-গাত্রে, কঠোর মরু প্রান্তরে, মার্ত্তণ্ডের রুদ্র তাপে পুড়িয়া পুড়িয়া তাঁহাকে জীবিকার জন্য পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। অন্নের কাঙ্গাল বস্ত্র-ভিখারী পৃথিবীর যত নরনারী, তাহাদের ব্যথার তপ্ত শলাকা তাঁহার অন্তরতলে একেবারে সোজাসুজি বিদ্ধ হইয়াছিল। সে দুঃখ-দীর্ণ চিত্ত ভেদিয়া সহানুভূতি ও করুণার যে ধারা উৎসারিত হইয়াছিল, তাহা প্রকৃতির বক্ষঃজাত উৎসের ন্যায়ই নিত্য ও নির্ম্মল। দুঃখীতাপিতের ভার বহিতে জন্ম হইতে দুঃখের দীক্ষা তিনি লাভ করিয়াছিলেন; দুঃখের অগ্নি তাঁহাকে নির্ম্মল করিয়াছিল, দুঃখের তুফান তাঁহার বাহু দৃঢ় করিয়াছিল, দুঃখের আঘাতে তাঁহার মেরুদণ্ড করিয়াছিল,

সবল হইয়াছিল। দৈন্য তাঁহাকে স্নিগ্ধ ও সন্তোষ তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াছিল।

কিশোর বয়সেই তিনি মানব সমাজের নিত্য পরিচিত স্বাভাবিক প্রতিনিধিরূপে আমাদের চক্ষুর সমীপে উপস্থিত হন। তিনি অলস জীবন যাপন করেন নাই, পিতৃপুরুষের অযত্নাগত ধনাধিকারী ধনীর অকর্ম্মণ্য নন্দদুলালরূপেও আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না। অন্নহীন ভিখারীরূপে তিনি হাহাকার করেন না, দরিদ্রের রক্ত শোষণ করিয়া তিনি সুখের সৌধ নির্ম্মাণেও তৎপর নহেন। তিনি বিশ্বের লক্ষকোটি জনগণের আত্মীয়রূপে শান্তমনে জীবিকার্জ্জনের জন্য পরিশ্রম করিতেছেন; মক্কার রাজপথে তাঁহার কর্ম্ম-চঞ্চল চরণ সর্ব্বদা ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে। পরিশ্রমে তাহার দেহ সবল, আত্মনির্ভরে ললাট সমুন্নত, সন্তোষে তাঁহার আনন প্রভাত-কমলের মত মনোহর।

ব্যবসায়ীরূপে তিনি বহির্জগতের মানবসমাজের পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে পাপ ও ব্যথার যে অগ্নিস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল,

তাহার জ্বালা তাঁহার চিত্তকে সাক্ষাতভাবে স্পর্শ করিয়াছিল। রক্তলোলুপ জিঘাংশু আরব-সমাজে তিনি রোগীর সেবা করিতেন ও কলহের মীমাংসা করিতেন। কিশোর বয়সে রণক্ষেত্রে হতাহত সৈনিকের শুশ্রুষা করিয়া তিনি আরবের অগ্নিক্ষেত্রে সমবেদনা ও কর্ত্তব্যবোধের আশ্চর্য্য ও মহান দৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রসন্ন নয়ন শিশু সমীপে আনন্দ-হাস্যে উজ্জ্বল হইত, রোগীর পার্শ্বে সেই প্রফুল্ল বদন ঘিরিয়া করুণার ছায়া নামিয়া আসিত, তিনি অশান্তি-ক্ষেত্রে শান্তির দূতরূপে অগ্রসর ও গৃহীত হইতেন। বিশ্বাস করিয়া ধনসম্পত্তি তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখা যাইত। এইরূপে প্রতি প্রয়োজন সাধন করিয়া সততা ও পটুতায় কোরেশকূলের বিশ্বস্ত 'আমিন'-রূপে তিনি সকলের শ্রদ্ধা অধিকার করিয়াছিলেন।

ভবিষ্যতে যাঁহার শক্তির প্লাবন দেশ কুল ভাসাইয়া বিশ্বমানুষের মঙ্গল সাধন করিয়াছিল, যৌবনে তিনি জাতির সম্মুখে উন্নতি ও কল্যাণের পরিষ্কার আদর্শ ছিলেন; কোটি কোটি নরনারীর

চিত্তাধীপ মহাপুরুষের জন্য তখন জাতি-নায়কের আসন সম্মুখেই অপেক্ষা করিতেছিল।

উদার আকাশতলে, বিশাল মরুপ্রান্তরে, গম্ভীর পর্ব্বতগাত্রে মুক্ত প্রকৃতি দিনে দিনে তাঁহার মনকে জ্ঞানালোকের প্রতি উন্মুখ করিয়াছিল। তিনি শৈশব হইতেই চিন্তাশীল, চতুর্দ্দিকে মানুষের দুঃখ, পাপ ও বর্ব্বরতা অনুক্ষণ তাঁহার চিত্তে চিন্তার ধারা প্রবাহিত করিত; সমবয়স্ক বালকদল তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে উল্লাসভরে ক্রীড়া করিত, তিনি বলিতেন বৃথা আমোদ প্রমোদের জন্য মানুষের সৃষ্টি হয় নাই, মহৎ উদ্দেশ্যে তাহার জন্ম।

• জীবনের এই গভীর অনুভূতি উল্লাস-চঞ্চল কিশোর বয়সে হৃদয় তাঁহার গম্ভীরভাবে পূর্ণ করিত, যৌবনের চঞ্চল কর্ম্মজীবনে জীবনের সুমহান উদ্দেশ্য-বোধ চিত্তের মধ্যে গভীর মন্দ্রে বাজিয়া উঠিত। প্রাণের মধ্যে প্রশ্ন জাগিত,— জীবন-মরণের রহস্য চিন্তায় চিত্ত তাঁহার অসীম আবেগে আকুল হইত;—কি আমি? কেন আসিলাম? কেন এ জীবন ধরিলাম? এই যে দৃশ্যমান অনন্ত বিশ্ব, ইহার মূলে কি রহস্য নিহিত

আছে? ইহার সহিত আমার এ জীবন-গতির কি গভীর সম্বন্ধ আছে? আমার চতুষ্পার্শ্বে এই যে দুঃখ ও পাপের ক্রীড়া, ইহার মধ্যে কি কর্ত্তব্য স্থির করিব?—কি উদ্দেশ্য সাধন করিব? তিনি বুঝিয়াছিলেন জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, বিপুল কোন কর্ত্তব্য তাঁহাকে সিদ্ধ করিতে হইবে।

জীবনের উদ্দেশ্য-চিন্তায় চিত্ত তাঁহার ধ্যানের মধ্যে মগ্ন হইত, দৃশ্যমান বিশ্ব হইতে অতীন্দ্রিয় ভাব-লোকে রহিয়া রহিয়া প্রয়াণ করিত। দিবস তাঁহার কর্ম্মে কাটিত, নিশায় তিনি মৌন প্রকৃতির রহস্য-তিমির ছিন্ন করিয়া সত্যের জ্যোতি বাহির করিতে চেষ্টার পর চেষ্টা করিতেন।

এখানেও সেই মানবের উদ্ধারকামী মহাপুরুষ মানুষেরই আত্মীয়রূপে সত্যের সন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি অধিকাংশ সাধকের মত মানুষের সংসারকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া একান্তরূপে নির্জ্জন অরণ্যবাসে প্রস্থান করেন নাই, সংসার-জীবনের সহিত সাধন-জীবনের যোগসূত্র অক্ষুন্ন রাখিয়াই সত্যলাভের সাধনা করিয়াছিলেন।

হেরা পর্ব্বতের নিভৃত গুহায় ধ্যানস্থ হইয়া আলোক পানের জন্য তিনি অধ্যাত্মের উচ্চ হইতে উচ্চলোকে উত্থান করিতেন, সাধনায় তাঁহার সপ্তাহ কাটিত, মাস কাটিত, আবার তিনি গুহা হইতে গৃহে ফিরিতেন, সংসারের কার্য্য করিতেন, আহার পানীয় গ্রহন করিতেন, আবার হেরার গম্ভীর গহ্বরে সত্য-সাধনায় মগ্ন হইতেন।

এইরূপে ক্রম-সাধনায় পনর বৎসর কাটিয়া গেল; বৎসরের পর বৎসরে তাঁহার হৃদয় সাধনায় মার্জ্জিত ও শুদ্ধ হইল। সুস্থির চিত্ত ভিতরে ভিতরে দলের পর দল মেলিয়া সত্যের আলোক-সম্পাতে স্নাত হইতে প্রস্তুত হইল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যৌবনের উদ্দাম জীবন অতিক্রম করিয়া মানুষের পরিণত বয়সের স্বাভাবিক জ্ঞান-জীবনে উপস্থিত হইলেন। সে জীবন হেরাপর্ব্বতের গহ্বরের মত গম্ভীর, মুক্ত মরুর নিশার নিশীথ নীরবতার ন্যায় সুগভীর; তাহা সাধনায় শুদ্ধ, বিজ্ঞতায় সুধীর, সূক্ষ্ম বিচারে সম্পুর্ণরূপে সক্ষম।

তখনই আলো জ্বলিয়াছে। তাঁহার মনুষ্যত্ব তখনই মহাপুরুষের মহিমায় ভাস্বর হইয়াছে।

কৈশোরের চপলতা ও যৌবনের উদ্দামতা অতিক্রম করিয়া চল্লিশ বৎসর বয়সে যখন তিনি বার্দ্ধক্যের সীমায় উপস্থিত হন,—যখন হৃদয়ের মানবোচিত চাঞ্চল্য স্বতঃই স্তব্ধ হইয়া আসে, মায়ামোহের বিভ্রবময়ী রাগিণী আর চিত্তের মধ্যে মত্ততা সৃষ্টি করে না, অভিজ্ঞতার আলোকে মন যখন ভ্রম-প্রমাদ মুক্ত হইয়া সত্য দৃষ্টি লাভ করে, তখনই স্থির নির্ম্মল বাপী-বক্ষে শুভ্র শুভ চন্দ্রোদয়ের মত তাঁহার হৃদয়ে জ্ঞানের হিরণ কিরণ উদ্ভাসিত হইয়াছিল। ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া জ্ঞান যখন আপনাআপনি পরিষ্কার হয়, বিজ্ঞতা যখন স্থিরতার সঙ্গে আপনা আপনি আগমন করে, সত্যের শুভ্র জ্যোতিঃ তখনই তাঁহার চিত্তফলকে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

এই মহাজ্যোতির প্রথম বিভাসে, সত্যপ্রকাশের মহামুহূর্ত্তে মহাপুরুষের মানব-ধর্ম্ম আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। স্বভাব-সিদ্ধ সত্য জীবনের অস্ফুট উষালোকে তাঁহার সঙ্গে মাটীর ধরার মানুষের যে শোণিত-সম্বন্ধের ছবি ফুটিয়াছে, মানুষের কাছে তাহা নিত্য-কালের সম্পদ হইয়াছে।

দৈবদ্যুতির প্রথম ছটায় তাঁহার চিত্ত চমকিত হইল, দৈববাণীর গম্ভীর নাদে তিনি সম্ভ্রম-শঙ্কায় কম্পিত হইলেন। তিনি কম্পিতকলেবরে গৃহে ফিরিয়া খোদেজা বিবিকে বলিলেন, 'ঢাক, আমায় ঢাক,—কাপড় দিয়া আমায় আবৃত কর'। ঐশী শক্তির তাড়িত তেজে রক্তমাংসের মানবদেহ সম্ভ্রম-সঙ্কোচে কম্পিত হইতেছে, সত্যজ্যোতির প্রথম ঝলক নর-নয়ন সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছে না।

কি মধুর এই দৃশ্য!—কি স্বাভাবিক ও সুন্দর। ফুলের বুঝি অরুণ-কিরণে নয়ন মেলিতে প্রথম প্রথম এমনই ভাবের সঙ্কোচ হয়। ভিতর তাহার রসে গন্ধে পূর্ণ হইয়াছে, দল তাহার বক্ষ মেলিতে আবেগভরে ফুলিয়াছে, পবনের নিমন্ত্রণ তাহার কর্ণের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, কিরণের চুম্বন সে অনুভব করিতেছে,—পবনে কিরণে নয়ন মেলিতে প্রাণ তাহার আকুল হইয়াছে, তথাপি বাতাসে তাহার শিহরণ আসে, ফুল ফুটি ফুটি করিয়া ফুটেনা, দল তাহার খুলি খুলি করিয়া খুলেনা, অজ্ঞাত আলোকরাজ্যে প্রবেশ করিতে কতই না সঙ্কোচ-ভরে ধীরে ধীরে পুষ্পকলি প্রস্ফুট হয়।

যে সত্যের শাশ্বত শক্তি লাভ করিতে প্রাণ তাঁহার কত কাল ধরিয়া উন্মুখ হইয়া ছিল, আজ তাহারই বিরাট বিকাশে মহাপুরুষের মানবচিত্ত সভয় সম্ভ্রমে কম্পিত হইল, তিনি মানবস্পর্শ লাভ করিতে বিহ্বল চিত্তে মানবসকাশে গমন করিলেন; বলিলেন, আমার ভয় করিতেছে, আমায় ধর। সাধনা সার্থক হইয়াছে, আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতেছে, মহাজীবনের আলোক-রাজ্যে প্রবেশ করিতে গম্ভীর রবে আহ্বান আসিয়াছে, কিন্তু তাঁহার মানব-মন সঙ্কোচভরে দুলিতেছে—কি শুনিলাম! কি দেখিলাম! কিসের এ মহা আহ্বান হৃদয়ে আমার প্রবেশ করিল!

মহাপুরুষের মহিমালাভের প্রাক্কালে হজরত মোহাম্মদের এই মানবস্থলভ দুর্ব্বলতাকে আমি সহস্র সম্ভ্রমে নমস্কার করি। তিনি মানুষকে বিস্মৃত হয়েন নাই, ঐশী শক্তির প্রবাহ মধ্যে মানুষকে বিসর্জ্জন দিয়া মানব-সত্তার উর্দ্ধদেশে মহাপুরুষের অলৌকিক মহিমাসন রচনা করেন নাই। তিনি মানবস্পর্শ লাভের নিমিত্ত মানবসকাশে আগমন করিয়া জড় জগতের লক্ষকোটি নরনারীর প্রাণের

মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। সুমহান ব্রহ্মলোক হইতে মুহূর্ত্তের জন্য তিনি মাটীর ধরার মানুষের নিকট ফিরিয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত্তে মানুষের জন্য দেবত্বলাভের অক্ষয় অধিকার সৃষ্ট হইয়াছে; মহাপুরুষের সত্যপূত মহিমালোকে (তাঁহার মানবচিত্ত বারেকের নিমিত্ত কম্পিত হইয়াছিল) সেইক্ষণে রক্তমাংসের মানবমন মহিমালাভের আশা আবেগে মহানন্দে নৃত্য করিয়াছে; এই দুঃখ ব্যথা ও ব্যর্থতাপূর্ণ জীবন লইয়া, শত শঙ্কা-সঙ্কোচভরা হৃদয় লইয়া রক্তমাংসের শরীরধারী মরণশীল দুর্ব্বল মানুষ মহাজীবনের মহিমালোকে আরোহন করিতে পারে,—ঊর্দ্ধজীবনের অন্তঃহীন গতিতে তাহারই জন্মগত অধিকার আছে।

---

# প্রাণের প্রতিধ্বনি।

মহাপুরুষের জীবন চিরদিন মানুষের নিকটে বিস্ময় ও সম্ভ্রমের বস্তুরূপেই রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার সত্য-সুমহান জীবন অনন্যসাধারণ ত্যাগ-মহিমার উজ্জ্বল কিরণে জ্যোতিষ্মান হইয়া হিমালয়ের ন্যায় উর্দ্ধে উঠিয়াছে, মানুষ তাঁহার চরণ-তলে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় সম্ভ্রমভরে নত হইয়া আছে। তাঁহার অঙ্গ হইতে প্রেম-করুণা ও সত্য-প্রেরণা সহস্র ধারায় প্রবাহিত হইয়া মানব-জীবনের ঊষর ভূমি সরস করিয়াছে, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে জীবন-পোষণ শ্যামল শস্যের সৃষ্টি দিয়াছে, তাপিত কণ্ঠ স্নিগ্ধ করিতে শীতল সলিল দিকে দিকে বিতরণ করিয়াছে, কিন্তু মানুষ কখনও তাহার সংসার-জীবনের ক্ষেত্রে চত্বরে ও বিপনি বাজারে তাঁহাকে একান্তরূপে লাভ করে নাই। সাধনা ও মহিমার বাহিরে সংসারের যে মানব-প্রাণ মাতৃস্নেহে বাৎসল্যরসে বিগলিত হয়

প্রবাসগামী সন্তানের জন্য করুণ বেদনায় কম্পিত হয়, রুগ্ন আত্মীয়ের শয্যা-শিয়রে বিষণ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকে ও প্রাণ-প্রিয়ের বিয়োগ-ব্যথায় নীরবে অশ্রুপাত করে,—যে প্রাণ আশায় উল্লসিত ও আনন্দে প্রফুল্ল হয়, সুখ-দুঃখের শত স্বরে গুঞ্জরমান মানুষের যে একান্ত নিজস্ব প্রাণ তাহার প্রতিধ্বনি সাধারণতঃ মহাপুরুষের জীবনের মধ্যে পাওয়া যায় না।

মহাপুরুষের ধ্যান-গম্ভীর মূর্ত্তি মানুষকে উদ্ধার করিয়া যেন চিরদিন মানব-সংসারের উপরে ও বাহিরেই রহিয়া গিয়াছে,—তাহা হিমালয়ের মত গম্ভীর, সাগরের মত বিশাল ও আকাশের মত উন্নত। তাহা শুধু সত্য, শুধু ত্যাগ, কেবল সাধনা ও মহিমা।—তাঁহার সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ শুধু কৃতজ্ঞতা, প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অপরিসীম সম্ভ্রম।

মহাপুরুষ বিরাট ভাবে সত্যের দণ্ড তুলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, মানুষ তাঁহার নিকট দীক্ষা লইয়া আপনার গৃহবাসে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহার নিভৃত অন্তঃপুরে মহাপুরুষ কখনও প্রবেশ করেন নাই। মানুষ মহাপুরুষের জীবনের মধ্যে

আত্ম জীবনের ছবি দেখিবার সাহস পায় নাই। আপনার রসরক্তের প্রবাহ মধ্যে মহাপুরুষের হৃৎস্পন্দন অনুভব করিবার অধিকার সে লাভ করে নাই। মহাপুরুষের ত্যাগদীপ্ত ও সাধন-কঠোর বিরাট জীবন মানবোন্নতির সর্ব্বপ্রধান সহায়ক বটে, তাঁহার মহামহিম উন্নত জীবন মানুষকে নিরন্তর উচ্চ স্তরে আকর্ষণ করিতেছে, তথাপি যেন সময় সময় মানুষের দুর্ব্বল প্রাণ তাঁহার একান্ততার জন্যই ক্রন্দন করে; যেন ধ্যানের মৌনতা ভাঙ্গিয়া শচী-মাতার বিলাপধ্বনি প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করে, শুদ্ধোদনের শোক-কাতর মুখ মনের মধ্যে করুণ বেদনা জাগাইয়া দেয়।

সেবা, ত্যাগ, প্রেম ও আত্মদান মানুষের মহামহিম সার্থকতা বটে, তথাপি মানুষের মধ্যে একটি করুণ কোমল হৃদয় আছে, তাহাও যে স্রষ্টার দান। তাহাকে যতই অন্তরালে রাখি, যতই উপদেশ দেই, যতই তাহাকে সাধনায় ফেলিয়া পেষণ করি ও গৌরিক বসন পরাইয়া দেই, তথাপি তাহা আছে,—কিছুতেই তাহা মরিয়া

যায় না,—কিছুতেই তাহার স্পন্দন স্তব্ধ হয় না। তাহারই সঙ্গে মহাপুরুষের সম্বন্ধ চাই। নহিলে তাঁহার সহিত মানুষের প্রাণের যোগ নিবিড় ও পরিপূর্ণ বলিয়া বোধ হয় না। তাই মহাপুরুষকে নমস্কার করিয়াই প্রাণের তৃপ্তি হয় না; তাঁহার সঙ্গে আহার করিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহার হাস্যধ্বনি শুনিতে চাই, পুত্রের বিয়োগ-ব্যথায় তাঁহার বিষণ্ণ মুখেরও প্রয়োজন আছে।

হজরত মোহাম্মদের জীবন-কথা চিন্তা করিলে মানুষ তাহার সম্ভ্রম-নত নয়ন তুলিয়া কৌতুহলে তাকাইতে পারে। তাঁহার জীবনের মধ্যে মানব-প্রাণের বড় মধুর প্রতিধ্বনি আছে। তিনি সত্যের দুর্জ্জয় সাধনা করিয়াছিলেন, ত্যাগের মহিমায় তাঁহারও জীবন উজ্জ্বল হইয়া আছে; প্রেমে তিনিও মানুষের জন্য অনাহারে রোদন করিতেন। তথাপি কেবল গম্ভীর ও দুস্তর ধ্যান—লোকেই তাঁহার আসন প্রতিষ্ঠিত নহে। সাধনার সুমহান শৈলচূড় হইতে তিনি মানব-সংসারের সমতলে নামিয়া মানুষের গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে দূরস্থিত ধ্যান গম্ভীর সাধক-

মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয় না। তিনি মানুষের প্রতি-দিনের সুখ দুঃখের অংশভাগী গৃহবাসী আপন জন, জনগণের আনন্দ ও অক্ষি-জল তাঁহার অশ্রু ও আনন্দের সহিত মিশ্রিত হইতেছে। মানুষের হৃদয়ের সহিত হৃদয় মিলাইয়া তাহার সমুদয় ব্যথা বেদনার মধ্য দিয়া তিনি মানুষকে উন্নত জীবনের প্রেরণা দিতেছেন।
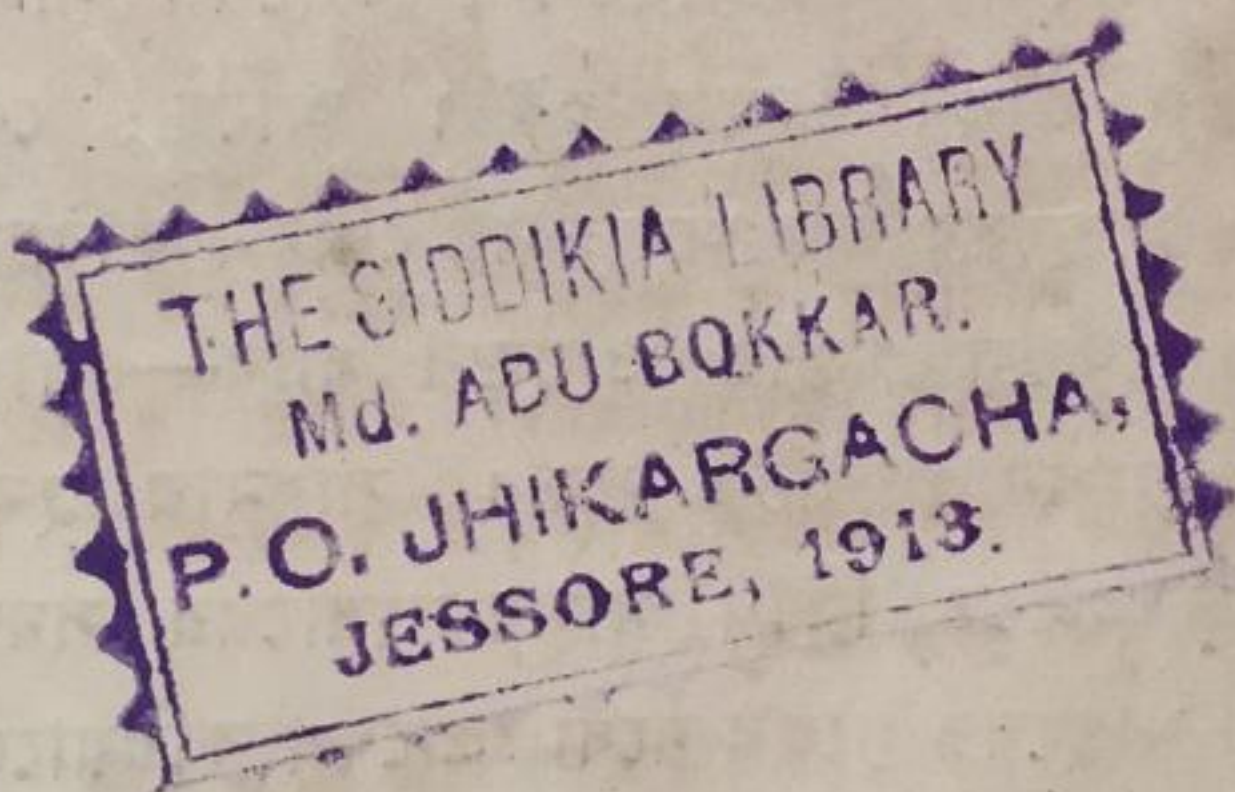
গ্রন্থকার প্রণীত

# নূরনবী

( ২য় সং )

হজরত মোহাম্মদের সরল ও সুমিষ্ট জীবন-চরিত এবং তাঁহার সত্য প্রেম সেবা ও মহত্বের মধুময় সত্য পরিচয়। গল্পের মত সরস, রূপকথার মত মনোরম,— আনন্দদানের ভিতর দিয়া চরিত্র-গঠনের পুস্তক। "এই পুস্তকের ভাষা সরল ও সহজ এবং বিষয় ও রচনা প্রণালী শিশু পাঠকদের পক্ষে মনোরম। এরূপ সহজ বাংলা ভাষায় লেখা কঠিন কাজ।" (রবীন্দ্রনাথ)। "হজরত মোহাম্মদের এরূপ সরস ও সতেজ জীবন-চরিত ইতিপূর্ব্বে আর লিখা হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।" (মানসী ও মর্ম্মবাণী)। ভাষার ঝরণার সজীব ধারায় এই আনন্দের ও আলোর গান, এই স্বপ্নের ও সত্যের গান সত্যই মধুময় হইয়া সার্থক হইয়াছে।" (দক্ষিণারঞ্জন)। পাতায় পাতায় ছবি, সুন্দর ছাপা, সুদৃশ্য বাঁধাই। মূল্য দেড় টাকা।

মোহসিন এণ্ড কোং

৯৩ নং বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

গ্রন্থকার প্রণীত

# শান্তিধারা

( ২য় সং )

ইস্‌লামধর্ম্মের রস-মধুর মর্ম্ম-কথা ও মানবাত্মার চিরন্তন বেদনা-বাণী ; ভাষার লালিত্যে ও মাধুর্য্যে, ছন্দে ও বেগে, বিশুদ্ধতা ও মাদকতায় বঙ্গভাষায় এক অপূর্ব্ব ও অনুপম সাহিত্য-সম্পদ। "উদ্ভ্রান্ত প্রেমের" পরে বঙ্গ সাহিত্যে এমন কবিত্বময় উৎকৃষ্ট সাহিত্য-পুস্তক আর বাহির হয় নাই। ভাষা সঙ্গীতের মত সুমধুর, আত্মার আকুল ব্যথায় প্রাণস্পর্শী ও প্রাণারাম। ইস্‌লামের স্বরূপ, আজানের উন্মাদনা, নামাজের সাধনা এই পুস্তকে মানব-মনের মাধুরী মাখিয়া অপূর্ব্বরূপে দেখা দিয়াছে।—"মধুর হইতে মধুরতর ভাষায় এই পুস্তকের প্রতি প্রবন্ধ রচিত; প্রত্যেক প্রবন্ধ এক একটি হীরক খণ্ডের মত, আপনার জ্যোতিতে আপনি সমুজ্জ্বল।" ( সৈয়দ এমদাদ আলী—ভূতপূর্ব্ব "নবনূর"—সম্পাদক )। উৎকৃষ্ট কাগজে পাইকা অক্ষরে ছাপা, সুন্দর বাঁধাই। মূল্য বার আনা।

মোহসিন এণ্ড কোং

৯৩নং বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—

নারী-তীর্থ

৪।১।১ ছকু খানসামার লেন।

---

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যসমিতি

৩২ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

---

মখদুমী লাইব্রেরী

৫।এ কলেজ স্কোয়ার।

---

মোস্‌লেম পাবলিশিং হাউস।

এবং

ইউ, এন, দাস এণ্ড কোং

৬২ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

গ্রন্থকার প্রণীত

# ধর্ম্মের কাহিনী

( ২য় সং )

এই পুস্তক ধর্ম্মের এক করুণ বেদনার কাহিনী। সংসারের মানুষ কিরূপে ধর্ম্মের নামে নিত্য ধর্ম্মকে ফাঁকি দিতেছে, কেমন করিয়া মিথ্যা মানুষের হাড়ে মাংসে রক্তে জড়াইয়া আছে, তাহার উজ্জ্বল চিত্র। মানুষের নিভৃত মনের গোপন কথা—প্রতিদিনের সংসার-জীবনের নিখুঁত ছবি—আপন আপন মনের ফটো। রচনা রস-কৌতুকে সুমধুর—হাসিতে উজ্জ্বল—অশ্রুতে সজল। বড় করুণ—বড় মধুর। মূল্য চারি আনা।

---